



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 595 - 605

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ঠাকুরবাড়ির পত্র-পত্রিকার নান্দনিকতা ও মতাদর্শ

রাজকুমার প্রামাণিক

স্টেট এডেড কলেজ টিচার-1, নেতাজি মহাবিদ্যালয়

Email ID: rbuaju@gmail.com

 0009-0001-5437-4468

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Jorasanko,
Family,
Tattvabodhini,
Magazine,
Social,
Rabindra,
Wisdom,
Manifestation.

Abstract

The emergence of the 19th century new consciousness was welcomed by all the members of the Jorasanko Tagore family. The education system of their inner city was developed in line with Western education. They were pioneers in the creation of art, literature, and culture. Naturally, they felt the need for a magazine to express literary ideas. And through the editing of this magazine, they left a mark on the entire literary world. Tattvabodhini magazine, founded by Debendranath Tagore, was one of the most important magazines of that time. The magazine played a guiding role in social reform. The magazine was the first to introduce modern editorial style in Bengali. Under the leadership of Rabindra, magazines like Bharati, Balak, Sadhana introduced a new language, new ideas, and modern style in Bengali literature. These magazines taught new writers to write and refined Bengali prose. In the continuation of publishing various magazines for children, the first puja-anniversary was published from Thakurbari in 1918- 'Parvani.' Parvani' is not just a puja-number, but a historical document carrying the legacy of the literary and cultural heritage of the Thakurbari. The wonderful combination of progress and eternity took place in wisdom and its manifestation was in the pages of 'Punya'. It was like a bridge— where the solemn beauty of tradition was illuminated by the light of modernity, and literature became a meeting point for the eternal with the contemporary. The magazine 'Ananda Sangeet', jointly edited by Pratibha Devi and Indira Devi, created a glorious chapter in the world of music. In a word, these magazines not only enriched the flow of literature and culture, but also opened new horizons in the advancement of Bengali women's thoughts and ideas. The magazines edited and published by the combined efforts of the men and women of the Tagore family took Bengali literature and culture to an unprecedented height. By building a bridge between tradition and modernity, the magazines ushered in a new era in Bengali social life—where literature became not just a field of taste, but also one of the tools of social awakening and cultural progress.

Discussion

উনিশ শতকের নবচেতনার উন্মেষকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সকলে স্বাগত জানিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুঘর্ষে গড়ে উঠেছিল তাঁদের অন্তঃপুরের শিক্ষার ধারা। শিল্পচর্চা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সৃজনে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। স্বভাবতই সাহিত্য ভাবনা প্রকাশ করতে পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। আর এই পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যগুলি সৃজিত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির পত্রিকাগুলিকে প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজালে তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, তার পরেই আসে বালক। পরে সাধনা, পুণ্যসহ আনন্দ সংগীত, সারদা ও চতুরঙ্গের মত অনেক পত্রিকা বেরিয়েছে। সবগুলি যে বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা তা নয়। ধর্মের অনুপ্রবেশের সাথে সাথে সঙ্গীতের মুর্ছনাও আছে পত্রিকাগুলিতে। আমরা পত্রিকাগুলি সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর গুরুত্ব তুলে ধরব।

‘তত্ত্ববোধিনী’

ধর্মচর্চা করার জন্যই ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেসময় সাময়িক পত্রিকা তেমন ছিলই না, কোনরকম প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগও ছিল না। ‘তত্ত্ববোধিনী’ সেই অভাব দূর করে। তবে ধর্মচর্চাতেই পত্রিকাটি সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামাজিক ও সাহিত্যিক ভাবনা প্রকাশে পত্রিকাটি উদ্যোগী হয়েছিল। টানা ৯০ বছর (১৮৪৩-১৯৩২) পত্রিকাটি চলেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ সহ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখও সম্পাদনা করেছেন। বারবার সম্পাদক পরিবর্তন পত্রিকাটিতে ঘটেছিল। পত্রিকার বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল। ‘বৌদ্ধসাধনা’ বা ‘বেদান্তবাদে’র পাশাপাশি ‘মেঠো ঝুঁয়াপোকা ও তাহার প্রজাতি’ নিয়েও প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। পত্রিকাটি সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল। পত্রিকার সাথে ঠাকুরবাড়ির বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। কখনো সেই বন্ধন শিথিল হয়নি। ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি মহিলা সদস্যগণও নিয়মিত পত্রিকায় লিখেছেন। ঠাকুর বাড়ির নানা সংবাদ পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছে। পত্রিকাতে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনে কোনরকম সীমাবদ্ধতা ছিল না। তাই মদ্যপানের অন্ধকারময় দিকের পাশাপাশি আলোকময় বিজ্ঞানভাবনাও প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠেছিল। ঠাকুরবাড়ির হেমেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানধর্মী কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। পত্রিকাটিতে ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক অনেক খুঁটিনাটি তথ্য মিলত। সেজন্যই পত্রিকাটি ঠাকুরবাড়ির ঘোষিত পত্রিকা না হয়েও পারিবারিক পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। পত্রিকার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির একটি আত্মিক বন্ধনও তৈরী হয়েছিল। এজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ নতুন পত্রিকা প্রকাশ করতে চাননি।

‘ভারতী’

সাহিত্য পত্রে ‘বহুবিষয়তা’ একান্তভাবেই কাম্য। সেদিক থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম পত্রিকা হয়ে উঠেছিল ‘ভারতী’ (১৮৭৭)। বহুদিন পত্রিকাটি ঠাকুর বাড়ি কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। পত্রিকাটি প্রকাশলগ্নে ছিল একান্তভাবেই পারিবারিক। বহুমুখী রচনার মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি অচিরেই সর্বজনীন হয়ে ওঠে। ‘ভারতী’ পত্রিকাটির উদ্দেশ্য হল— বাণী, বিদ্যা ও ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা— এই তিনের সেবা করা। বাণী বলতে স্বদেশীয় ভাষার কথা বলা হয়েছে। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ হলেও প্রধান উদ্যোক্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং লেখক রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকার আয়ুষ্কাল ছিল ৫০ বছর। এই সময়ের মধ্যে ‘ভারতী’র সম্পাদক বেশ কয়েকবার বদল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সম্পাদনার দায়িত্বভার সামলেছেন। যদিও তাঁর সম্পাদনার সময়কাল মাত্র এক বছরের। পত্রিকাটির দায়িত্বভার ঠাকুর বাড়ির লোকজনই সামলে ছিল একাধিকবার, একটিবার কেবলমাত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ঠাকুর বাড়ির জামাতা ও জামাতা বান্ধবের হাতে। ‘ভারতী’ সম্পাদিত হয়েছে ক্রমাশয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাড়ির জামাতা মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা। সরলা দেবী এককভাবে সম্পাদনা করেছেন দুটি পর্বে, আর কিছুকাল হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে। মনিলাল ও সৌরীন্দ্রমোহনও যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী দু’পর্বে সম্পাদনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন তখন মৃতপ্রায়। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র হিসাবে ছিল দু-তিনটি

- তার মধ্যে অন্যতম হল 'বান্ধব'। অতএব সাহিত্যঙ্গনে সেসময় 'ভারতী' পত্রিকার কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এজন্যই বাংলা সাহিত্যের আকাশে 'ভারতী' অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' একটানা সাত বছর প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় 'ভারতী'তে অধিক গুরুত্ব পেত গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ। প্রথম সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের উপর সমালোচনা বের হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৬ বছর। নবীন বয়সে কবির ভেতরে ছিল ছটফটানি, নতুন কিছু বলার প্রয়াস। সেই হিসেবে তাঁর মনে জেগেছিল 'অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার বাসনা।' 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল তাঁর কবিতা ও গল্প। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' 'ভারতী'তেই প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরীর মৃত্যুর সাথে সাথে 'ভারতী' পত্রিকার সেবকরা পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারতী' বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।" সেই সংকটময় ঘোর দুর্দিনে 'ভারতী'র গুরুভার নিজ হাতে তুলে নিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। শরৎকুমারী চৌধুরাণী তাঁর 'ভারতীর ভিটা'য় লিখেছিলেন—

“ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধিয়া থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল— 'ভারতী'র সেবকরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, 'ভারতী' ধূলায় মলিন।”^১

এরকম পরিস্থিতিতে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয় দিলেন। ধুলো বেড়ে স্নেহ দিয়ে 'ভারতী'কে কোলে তুলে নিলেন। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি রক্ষা না করলে আজ 'ভারতী'র নামই অবলুপ্ত হয়ে যেত। তবে স্বামীর উৎসাহেই তিনি এর দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—

“সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম স্বামী জানকীনাথই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। স্বামীর উৎসাহ পূর্ণ সমর্থনেই তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্বভার নিতে অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন।”^২

সম্পাদনার ভার নিয়ে তিনি প্রথমেই মনের বিভিন্ন বিভাগ এবং তাদের অন্যতম যে জ্ঞান- সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের দিকটি নির্দেশ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্যের মতামত স্মরণযোগ্য—

“যে নারীকে পুরুষ তন্ত্র জ্ঞান রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছেন, সেই নারীরই সামর্থ্য রয়েছে জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার— ১২৯১ সালেই স্বর্ণকুমারী তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন।”^৩

তিনি পত্রিকাকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য বিজ্ঞানচর্চার কথা পত্রিকায় তুলে ধরেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রণালীকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানকে সহজেই বোধগম্য করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের নারীদের কাছে। তিনি জানিয়েছিলেন—

“বিজ্ঞানের মাত্রা যে তিনি বাড়াতে চান পত্রিকায়, তা বিশেষভাবে 'ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ'- এর কথা ভেবে, যাঁরা বিদেশি ভাষা জানেন না বলে 'বর্তমান কালের বিজ্ঞান- শিক্ষা করিতে অপারগ।’”^৪

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চার কথা বলছে একজন নারী, যা ভাবলেও অবাক লাগে। শুধু তাই নয়, একজন ভারতীয় মহিলা দ্বারা সাময়িক পত্র সম্পাদনা করা বঙ্গদেশে নয়, ভারতেও বিরল। একজন বাঙালি নারী বাংলাতে মাসিক পত্র সম্পাদিত করতে পারে— এ কথা তখন কল্পনার অতীত। স্বর্ণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভের মধ্য দিয়ে অনেক বাংলা নারীর সাহিত্য জগতের প্রবেশপথ-কে মসৃণ করে দিয়েছিলেন। অনেক নবীন লেখক গোষ্ঠীকে 'ভারতী'তে উৎসাহ দানের

মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে তাঁদের বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন করে দিয়েছিলেন। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

“ভারতী যে দীর্ঘজীবী হয়ে বঙ্গ সাহিত্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ শ্রীমতি স্বর্ণকুমারীর প্রতিভা। ...সমালোচকগণ ‘ভারতী’র প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর তাছাড়া লেখার সরলতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল ‘ভারতী’র ওপর।”^৬

নারীদের শিক্ষা-সম্পর্কীয় আলোচনা স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত ‘ভারতী’তে স্থান পেয়েছিল। ‘বর্তমান শিক্ষা’ নামক প্রবন্ধে মেয়েদের শিক্ষা আলোচিত হয়েছে। বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ, চিরবৈধব্য প্রথার সমালোচনা আছে। বিবাহ সংক্রান্ত নানা আলোচনা পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, যাদের স্বর্ণকুমারী দেবী ‘সামাজিক প্রবন্ধ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য— জনসাধারণের স্রোতে না ভেসে যুক্তি দ্বারা সামাজিক গতিবিধি নির্ণয় করা। ১২৯২ এর সম্পাদকীয়তে তিনি বলেছেন যে, একটি প্রস্তাবিত বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কথা। যার ফলশ্রুতি বিবাহ-সংক্রান্ত আলোচনাগুলি। ‘পঠদশায় বিবাহ’, ‘নিকট সম্পর্কে বিবাহ’ ‘বিবাহের জন্য পূর্ব অনুরাগ আবশ্যিক কিনা’, ‘হিন্দু বিবাহ’ ইত্যাদি শিরোনামাঙ্কিত রচনাতে নানা দিক থেকে বিবাহ পদ্ধতিকে দেখা হয়েছে। ‘একটি প্রস্তাব’ নামক রচনায় স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মেয়েদের জীবন-যাপনের পুরো ছাঁটটিতে যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রয়োজন তা বলেছেন। এছাড়া নারী-পুরুষের ক্ষমতায়ন নিয়েও বিভিন্ন রচনা পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। তেমনি একটি রচনা ‘পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব’ লেখিকা স্বর্ণকুমারী নিজে। বর্তমানে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে নারীর সুদীর্ঘকালের সামাজিক অবদানের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত ‘ভারতী’তেই প্রথম পাশ্চাত্য নারীবাদ এবং নারী আন্দোলনের কথা উঠে এসেছিল। এইভাবেই স্বর্ণকুমারী প্রবন্ধের ডালি সাজিয়ে ‘ভারতী’কে সজ্জিত করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত ‘ভারতী’তে ‘বিদেশিফুলের গুচ্ছ’ নামে একটি আলাদা বিভাগ প্রচলিত ছিল। এই বিভাগটির জন্য রবীন্দ্রনাথ বহু বিদেশী কবিতার অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। শেষে পত্রিকায় চিত্র বিনোদনমূলক লেখা, সিনেমার উপর লেখাও ছাপা হয়েছে। ১১ বছর (১২৯১-১৩০১) পরে আরো সাত বছর (১৩০১ থেকে ১৩১৫) তিনি সুনিপুণভাবে সম্পাদনার কাজ চালিয়েছিলেন। ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ উভয় পত্রিকা একসময় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছিল। পরে ‘বালক’ ‘ভারতী’-র সাথে মিশে যায়। স্বর্ণকুমারী দেবীর যোগ্য কন্যাধ্বয় হিরণ্ময়ী ও সরলাদেবী যুগ্মভাবে ‘ভারতী’ সম্পাদনার দায়ভার নিয়েছিলেন দু’বছর। মাঝে এক বছরের জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব নিয়ে পত্রিকাটিকে নবভাবে নবরূপে গড়ে তুলেছিলেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে সরলাদেবী ‘ভারতী’ সম্পাদনার কাজ নিজ হস্তে তুলে নেন। তাঁর সম্পাদনাতে পত্রিকাটি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাংলাতে সেসময় শীর্ষস্থান দখল করেছিল। তাঁর সাগ্রহে, সযত্ন ও চেষ্টাতে পত্রিকায় এক নব প্রবাহের ধারা বয়েছিল। দেশজুড়ে স্বদেশী আন্দোলনকে দীর্ঘতর করতে জনচেতনা জাগ্রত করেছিলেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পত্রিকার পাতায় প্রবল বিদ্রোহের সুর দেখা দিয়েছিল তৎকালীন সময়ে। তিনিই প্রথম ‘ভারতী’র লেখকদের সম্মান স্বরূপ দক্ষিণা প্রচলন করেছিলেন। ‘জীবনের ঝরাপাতা’ তে বলেছেন—

“আমি একটা নিয়ম করলুম- ভারতীর প্রত্যেক লেখককেই কিছু না কিছু পারিশ্রমিক উপহার দেব। এখানকার অনেক লোকের গুনে আশ্চর্য লাগবে যে, সেকালে এমন লেখকও ছিলেন যাঁরা লিখে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তাঁদের আত্মসম্মানের পক্ষে হানিজনক মনে করতেন।”^৬

যাঁরা অর্থ গ্রহণে অনিচ্ছুক হতেন তাঁদেরকে তিনি নববর্ষে বা আশ্বিনে ফাউন্টেন পেন বা ভালো বই উপহার দিতেন। তিনি আরো একটি নতুনত্ব পত্রিকাতে এনেছিলেন- ‘punctuality’ যথাসাময়িকতা, এর ফলে যথা সময়েই পত্রিকা বেরোনোটাই মাসিক পত্রিকা জগতের নিয়ম হয়ে গেল।

‘ভারতী’ ঠাকুরবাড়ির লেখকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আনুকূল্যে গৌরবান্বিত হয়েছে অনেক নতুন লেখক। তবে ঠাকুরবাড়িতেই ‘ভারতী’ সীমাবদ্ধ থাকেনি। বৃহত্তর সাহিত্য অঙ্গনে তার ছাপ পড়েছে। পত্রিকাটি গদ্য ভাষাতে এনেছে আধুনিকতা। বিষয়েও লেগেছে আধুনিকতার স্পর্শ। লেখা হয়েছে পতিতা জীবন নিয়ে হৃদয়বিদারক গল্প। তেমনই একটি গল্প হল ‘কুসুম’, লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়। ‘ভারতী’ ছিল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে অনেক নতুন লেখক তৈরি হয়েছিল। এ কাজটি খুব সুন্দর করতেন সরলা দেবী। তাঁর বক্তব্য—

“লেখক তৈরি করা আমার আর একটি সম্পাদকীয় কাজ ছিল... যে লেখাটার শরীরখানা এখন মড়ার মত, টেবিল থেকে টেনে বাইরে ফেলে দেবার যোগ্য, তারই পা থেকে মাথা পর্যন্ত অঙ্গ - প্রত্যঙ্গগুলি কাটা চেরা করে নতুন করে বসিয়ে খাড়া করলে জীবন্ত হয়ে উঠবে এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার উপর ‘অপারেশন’ আরম্ভ করতুম... ভারতীতে তাই আমার সম্পাদনা- ক্রিয়া কেবল mechanical ছিল না, শুধু মেশিনের মত কাজ নয়, মানবীয় রসে ভরা ছিল আমার সম্পাদকীয় জীবন।”^৭

সরলা দেবী বিভিন্ন বাঙালি এবং বঙ্গের মনীষীদের লেখা সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলি ভারতীতে প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন পত্রিকাটির শেষ সম্পাদিকা। আর্থিক অনটনসহ অন্যান্য কারণে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মতো ‘ভারতী’ও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

‘বালক’

ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা গুলিকে প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজালে ‘ভারতী’র পরই আসে ‘বালক’। ‘তত্ত্ববোধিনী’ ও ‘ভারতী’র তুলনায় ‘বালক’ের আয়ুষ্কাল সামান্য। প্রদীপ শিখা জ্বলে ওঠার আগেই নিভে গিয়েছিল। ‘বালক’ বেরিয়েছিল মাত্র এক বছর। ঠাকুর বাড়ির ছোটদের কথা চিন্তা করে জ্ঞানদানন্দিনী ‘বালক’ পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। ১৮৮৫ সালে ‘বালক’ প্রকাশিত হয়। প্রথম ঠাকুরবাড়িতে মহিলা সম্পাদিকার দেখা মেলে। প্রথম শিশু পত্রিকা হলো ‘বালক’। দেশীয় ভাষার উন্নতিবিধান এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতার জন্য ‘বালক’ পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন যুবক, পূর্ণ উদ্যমে লিখছেন। সে তালিকাতে কবিতা, উপন্যাসসহ, নাটক, প্রবন্ধ সবকিছুই ছিল। ওই বছরেই রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রাণশক্তিভে ভরপুর তখন তিনি। একের পর এক লিখে চলেছেন। তিনি যে পত্রিকার ভার গ্রহণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে তিনি জীবনস্মৃতিতে রসিকতা করে লিখেছেন –

“ ‘ছবি ও গান’ এবং ‘কড়ি ও কোমল’-এর মাঝখানে ‘বালক’ নামে একটি মাসিক পত্র একবছরে ঔষধির মতো ফসল ফলাইয়া লالا সংবরণ করিল।”^৮

পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তবে অলিখিত সম্পাদক ছিলেন যুব রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধু কলমই ধরেননি, পত্রিকাটির হালও ধরেছিলেন। তাঁর হাতে পড়ে পত্রিকাটি আরও বেশি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল। ‘বালক’কে সুন্দর করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

“বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজ বৌঠাকুরাণীর যথেষ্ট আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুবীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে।”^৯

পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল ছোটদেরকে সাহিত্যমুখী করে তোলা। শুধু ছোটদের জন্য লেখা নয়, তাদেরকে দিয়ে লেখানোর কাজটাও পত্রিকাটি করেছিল। পত্রিকাটি ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও লিখেছেন। আঠারো বছরের বালক

হিতেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন গল্প 'বারো আনা ষোল আনা'। 'বালক' পত্রিকাতে লিখেছিলেন কিশোর অবস্থাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যাদ্বয়-হিরণ্যায়ী ও সরলা দেবী। দ্বিজেন্দ্র পুত্র সুধীন্দ্রনাথও কলম ধরেছেন। আর এভাবেই ভবিষ্যতের লেখক তৈরীর চেষ্টা শুরু হল। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, সম্পাদিকা হয়েও জ্ঞানদানন্দিনী 'বালকে' লিখতে তাঁকে অনুরোধ করেন। যার ফলশ্রুতিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত বালক পত্রিকায় ১৩টি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছিল পাঁচটি।

পত্রিকাটির প্রচ্ছদ মন হরণ করে নেয়। একটি গাছের ডাল তাতে একটি পাখির বাসা এবং বাসাতে চারটি পক্ষীশাবক। তাদেরকে দুটি পাখি খাওয়াচ্ছে। পাখির বাসাতে 'বালক' কথাটি লেখা। এ থেকেই স্পষ্ট এ, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্যই তিনি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পত্রিকাতে কেবল রচনা, প্রবন্ধ ছিল না, চিত্রও ছিল অনেক। পত্রিকার সম্পদই ছিল ছবি। রচনার পাশাপাশি প্রচুর ছবি ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। হরিশ্চন্দ্র হালদার এবং সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন চিত্রকর। পত্রিকাতে ছবির সংখ্যা ছিল ৩৩টি। ছবি ছাপা হয়েছিল লিথোগ্রাফিতে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সেই বিখ্যাত কবিতা "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর/ নদেয় এলো বান।" কবিতাটিতে সুন্দর একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে হরিশ্চন্দ্র হালদার দ্বারা। এই প্রথ সংখ্যায় চারটি সচিত্র আছে। 'সূর্যের কথা', 'দার্জিলিং যাত্রা', 'সহজে গান শিক্ষা' এবং 'ব্যায়াম' রচনাগুলি চিত্র সহযোগে লেখা হয়েছিল। এর মধ্য 'দার্জিলিং যাত্রা'-র লেখক ছিলেন সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি নিজেই দার্জিলিং - এর ছবিটি অঙ্কন করেছেন। পত্রিকাটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে ছোটদের জন্য প্রকাশিত হল 'মুকুট' নামে বড় গল্প। তৃতীয় সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'রাজর্ষি'। অকারণে রক্তপাত, স্বার্থ আর লোভের জন্য হানাহানি— এসব কিছু তিনি এমন ভাবে ছোটদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, যাতে তারা সহজেই বুঝতে পারে। এখানেই প্রকাশ পায় তাঁর 'হেঁয়ালি নাটক'-গুলি। ছোটদের জন্য পত্রিকাতে নাটকের প্রকাশও এই প্রথম। এছাড়া তিনি প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক নিবন্ধ, চিঠিপত্রসহ শব্দতত্ত্ব বিষয়ক লেখাগুলি লেখেন। এভাবেই ঠাকুরবাড়িতে শিশুদের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। যদিও পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র একবছরের। তবুও এই পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্য দিয়ে এক নব ভাবনার সূচনা হয়েছিল। সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ছোটদের লেখা মানেই 'ছেলেমানুষি' নয় রীতিমতো সচেতন ভাবে কল্পনা শক্তি জাগ্রত করে দেওয়া। প্রাসঙ্গিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের মেজ বৌ ঠাকুরানীর কথা বলতেই হয়। তিনি শিশু সাহিত্যের উন্নতিকল্পে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। এমনকি তিনি ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য লিখেছিলেন দুটি নাটক 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'টাকডুমাডুম'। নাটক দুটি চলিত ভাষাতে লেখা। তৎকালীন সময়ে চলিত ভাষায় এরকম লেখা প্রশংসার দাবি রাখে।

ঠাকুরবাড়িতে 'বালক' পত্রিকার হাত ধরেই ছোটদের জন্য নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তার জন্ম হল। সেই জন্যই ঠাকুরবাড়ি ও তার বাইরে অনেকেই লেখনি ধরলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর প্রবন্ধ, অনুবাদ প্রায় সব সংখ্যাতেই দেখা যেত পত্রিকায়। সত্যেন্দ্রনাথ 'বালকে'র জন্য কলম ধরেন। এছাড়া 'বালকে'র পৃষ্ঠাতে দেখা গেল প্রজ্ঞাসুন্দরীর গানের স্বরলিপি, বালিকা সরলা দেবীর প্রবন্ধ এবং ঠাকুরবাড়ির অন্য বালক-বালিকাদের রচনা। পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন মোহনলাল। তাঁর 'বাবুইয়ের এডভেঞ্চার' ও 'বোডিং ইঙ্কুল' উপন্যাসদ্বয়-এর উল্লেখ করা যায়। তবে এ কথা স্বীকার করে নিতেই হয়, 'বালকে' প্রকাশিত রচনার অধিকাংশই ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের লেখা হলেও অবনীন্দ্রনাথের কোন লেখা নেই কারণ 'বালক' প্রকাশের সময় তিনি খুব ছোট ছিলেন।

'বালকে' যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি হল— 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); 'কাজের লোক কে?' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); 'সূর্যের কথা' (নরেন্দ্র বালা দেবী); 'দুর্ভিক্ষ' (সরলা দেবী); 'বারো আনা ও ষোল আনা' (হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর); 'ব্যায়াম' (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী); 'আশ্চর্য পলায়ন' (জ্ঞানদানন্দিনী) প্রভৃতি। ঠাকুর বাড়ির সদস্যসহ অনেকেই কলম ধরেছিলেন। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত জ্ঞানদানন্দিনীর 'ব্যায়াম' রচনার প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখেন 'লাঠির উপর লাঠি' নাম দিয়ে। এটি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। দেওর এবং বৌদির এই বাদানুবাদ নিয়ে কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'লাঠালাঠি' নামে একটি রম্যরচনা লেখেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য — "এক সংখ্যায় 'লাঠি' বলে

একটি লেখা বাহির হয়। সেই সংস্রবে বোধ হয় মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ) ঠাকুর লাঠির উপর লাঠি চালান। আমি ‘লাঠালাঠি’ লিখে সেটা শেষ করে দি। ...তখন কে জানত যে, কার প্রসঙ্গে এই বাচালতা করা হচ্ছে।”

জ্ঞানদানন্দিনীর উদ্যোগে পত্রিকাটি বের হলেও তিনি নিজে কেবলমাত্র একটি গল্প লিখেছেন। গল্পটির নাম ‘আশ্চর্য পলায়ন’। গল্পটি কনটেম্পোরারি রিভিউ প্রকাশিত ডেবাগোরিও ম্যাগিয়েচিভ রচিত গল্পের অনূদিত রূপ। তৎকালীন সময়ে অনেক লেখকগণ নাম প্রকাশ করতে চাইতেন না। ‘বালক’ পত্রিকাতেও তেমন কয়েকটি রচনার পরিচয় মেলে। যেখানে স্ত্রী, শ্রীমতি, শ্রীমো ইত্যাদি নামে লেখা প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে চিত্রা দেব বলেছেন—

“এই শ্রীমতি ইঃ’ যে ইন্দিরা, তাতে সন্দেহ নেই। তখন থেকেই ইন্দিরার আত্মগোপনের চেষ্টা শুরু হয়েছে।”^{১০}

রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা ছিলেন প্রতিভাসুন্দরী দেবী। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। দেশি ও বিদেশি উভয় সঙ্গীতে তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। নিজ বাড়িতেই একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, নাম ছিল ‘সংগীত সংঘ’। ‘বালক’ জ্যেষ্ঠ থেকে ভাদ্র সংখ্যতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘গান অভ্যাস’ শিরোনামে চারটি রচনা। প্রতিভা দেবী সংগীত জগতে বাঙালি মেয়েদের পথ দেখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা নিয়েছিল ‘বালক’ পত্রিকা। শোনা যায়, ১২৯২ সালে ‘বালক’র জ্যেষ্ঠ পত্রিকায় বন্দেমাতরম গানের সাত পংক্তির স্বরলিপি প্রকাশ করেন তিনি। ‘বালক’ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি প্রাচীন সংগীত শিল্পীদের ইতিহাস অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। তবে কেবল মাত্র ছোটদের লেখাতে তো আর পত্রিকা চলবে না। তাই দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় রবীন্দ্রনাথের উপর।

বালক ছিল বর্ণময় পত্রিকা। গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী, নাটকসহ বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি অভিনব হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সময়ে ‘শ্রী’ রচিত ‘নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড’ নামক সংবাদপত্রে সত্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে ‘চতুর্দশ বর্ষের বালক’ নামক গল্পে। পত্রিকাতে সরলা দেবীর ‘দুর্ভিক্ষ’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে তৎকালীন সময়ের মানুষের চিন্তন শক্তি কেমন ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে মানুষের মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে।

সম্পাদকের উৎসাহে রবীন্দ্র-অগ্রজ তিন ভাই ‘বালক’ পত্রিকায় লিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘মুখ চেনা’ নামে একটি রচনা লিখেছিলেন ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকাতে। রচনায় মুখের আকার অনুযায়ী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন। এরকম রচনা সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম। এছাড়া ‘মাংস আহার’, ‘বরিশালের পত্র’, ‘নব্য ভারতের মানচিত্র’ প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে পত্রিকাটিকে ঋদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্র-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন খুব মজারে মানুষ, অনেকটা আত্ম-ভোলা প্রকৃতির। তিনি পত্রিকায় লিখলেন ‘রেখাম্বর বর্ণমালা’ ছোটদের জন্য। পয়ারের আঙ্গিকে লেখা এই রচনাটি ছিল চিত্রমূলক। রচনাটিতে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে। রচনার মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এতে বাংলা লিপির সহজে পাঠের জন্য চিহ্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ছোটদের আকৃষ্ট করেছিলেন। রচনাটির মধ্য দিয়ে বাংলা বর্ণমালার জগতে নতুন চিন্তাভাবনার জগৎ খুলে দিয়েছিলেন। পত্রিকাতে গ্রন্থ সমালোচনাও প্রকাশ হত। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ‘নতুন নিয়ম’ বাইবেলের অনূদিত রূপের সমালোচনা করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘বালক’ পত্রিকারও সমালোচনা হয়েছিল। ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

“শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকে নানা বিষয় সহজ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অতি সরল বাংলা ভাষায় এই পত্রিকাখানির সম্পাদিকার কার্য সম্পাদনা করিতেছেন। ...এই পত্রিকায় যে যে বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা বালক কেন অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও অবগত নহেন।”^{১১}

পত্রিকাটি কেবল ঠাকুর পরিবার নয়, ঠাকুর পরিবারের বাইরের লেখকদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। দার্জিলিং যাত্রা, কাঞ্চন, শৃঙ্গ, নদী যা- ভ্রমণ প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনীর সাথে সাথে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার পরিচয় মেলে। মজার বিষয়ও বাদ যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ‘হেঁয়ালি নাট্য’ শিরোনামে এক বিশেষ ধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। তিনি নামকরণের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন—

“ইংরেজদের ‘শারাড’ নামক এক প্রকার খেলা আছে আমরা বাংলায় তাকে হেঁয়ালি নাট্য বলিলাম।... পাঁচজন কিংবা চারজনে মিলিয়া এই হেঁয়ালি নাট্য অভিনয় করিবেন, এবং বাকি সকলকে এই নাট্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শব্দটা বাহির করিয়া দিতে হইবে।”^{১২}

ন’টি সংখ্যাতে রচনা করেন তিনি এটি। বালককে আরো পাঠকদের কাছে আকর্ষণ করে তুলতে এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে ‘পাঠকদের প্রতি শিরোনামে’ অংশ যুক্ত করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছিল, যা কৌতূহলের উদ্রেক করে। বলা হয়েছিল—

“বালকের যে কোন গ্রাহক ‘হুজুগ’, ‘ন্যাকামি ও আহুদ’ শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট সংক্ষেপ সংজ্ঞা লিখিয়া পৌষ মাসের ২০ শে তারিখে আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাকে একটি ভালো পুরস্কার দেওয়া হইবে।”^{১৩}

‘বালক’ পত্রিকাটি ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান’ কবিতা দিয়ে শুরু হলেও সব লেখা বালকোচিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—

“তাঁহার বালক দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, উহা তিনি যে সব লেখা বালকদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচি সম্বন্ধে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালক কালের জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচির মাপকাঠি অনুসারে ঠিক করিয়াছিলেন।”

বালক পত্রিকার বছরে মূল্য ছিল দু টাকা, প্রথমে পত্রিকাতে লেখার সাথে সাথে লেখক এর নাম ছাপা হত না। পরবর্তীকালে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। প্রথমদিকে বালক ছিল চিত্রশোভিত, পরে চিত্রবিহীন অথচ প্রশস্তিতে ভরপুর। আর্থিক অনটন, লেখার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহ হয়ে পরা সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সময়ের অভাব— সবকিছু মিলিয়ে ‘বালক’ গৌরব হারিয়ে ফেলছিল। তাই পত্রিকাটির কার্যাধ্যক্ষের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ 1293 বঙ্গাব্দে অবসর নেন। তখন জ্ঞানদানন্দিনীর একার পক্ষে পত্রিকা দেখা শোনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পত্রিকাটিকে ‘ভারতী’র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার। এ প্রসঙ্গে ‘ভারতী ও বালক’ নতুন বৎসরে ‘ভারতী’ শিরোনামের বিজ্ঞপ্তি অংশ স্মরণযোগ্য— “আজ হইতে ‘বালক’ ‘ভারতী’র সহিত মিলিত হইল। পাঠকেরা মনে করিবেন না ইহাতে ‘ভারতী’র গাভীর্য নষ্ট হইল— কিংবা ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল, কারণ ‘বালক’ নামেমাত্র বালক ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল।”

‘ভারতী’ ও ‘বালক’র মিলনে ‘ভারতী’র বল বৃদ্ধি হবে এরকম আশা করেছিলেন। ছ’বছর ‘ভারতী ও বালক’ নাম দিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি কেবলমাত্র ‘ভারতী’ নামেই প্রকাশিত হয়। চিরদিনের জন্য বালক নাম লুপ্ত হয়। আসলে পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কার্যাধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ায় পত্রিকার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যায়। বহু বিষয়ে জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধিত বালক পত্রিকা ছিল শিশুদের মননের একটি বর্ণাঢ্য পত্রিকা। পত্রিকাটি শিশু ও কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এই শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে সাহিত্য-প্রেম ও জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে। পত্রিকাটি অনেক নবীন ও অল্প বয়স্ক লেখক এবং লেখিকাদের জন্য একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছিল। পত্রিকায় শিক্ষামূলক, নীতিগত, বিজ্ঞানধর্মী এবং বিনোদনমূলক বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হত, যা শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও মননের বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। শিশুদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাসও পত্রিকাটি গড়ে তুলেছিল।

‘পার্বণী’

ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকার নবতম সংযোজন ‘পার্বণী’। এটি ছিল প্রথম প্রথম পূজা-বার্ষিকী, যা প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন ঠাকুরবাড়ির জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম সংখ্যাটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ‘স্নেহের মঞ্জুরাণীকে’, যিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্রী তথা সুরেন্দ্রনাথের কন্যা। এই পূজা-সংখ্যার লেখকগোষ্ঠীও ছিল বৈচিত্র্যময়। ঠাকুরবাড়ির বহু সদস্য যেমন কলম ধরেছিলেন, তেমনি তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকা সাহিত্যিকরাও অংশ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রিলা দেবী প্রত্যেকেই তাঁদের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পাশাপাশি জগদানন্দ রায়, জীবনময় রায় ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারও লেখনী দিয়েছিলেন। শুধু সাহিত্য নয়, শিল্পকলারও এক উজ্জ্বল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় ‘পার্বণী’তে। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর তাঁদের আঁকা ছবির মাধ্যমে পত্রিকাকে রূপ দিয়েছিলেন এক অনন্য সৌন্দর্যে। ফলে ‘পার্বণী’ হয়ে উঠেছিল সাহিত্য ও শিল্পের এক মিলিত উৎসব, যেখানে ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক আবহ প্রতিফলিত হয়েছিল পূর্ণতর রূপে। ‘পার্বণী’ কেবল একটি পূজা-সংখ্যা নয়, বরং ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহনকারী এক ঐতিহাসিক দলিল। এর পাতায় মিশে আছে পারিবারিক স্নেহ, সাহিত্যিক মেধা ও শিল্পের সৌন্দর্য, যা আজও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিষ্কের মতোই উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের চিত্ত জয় করেছিল পত্রিকাটি। তাই তিনি সম্পাদক কে জানিয়েছিলেন—

“আমি ইহার বৈচিত্র্য, সৌষ্ঠব ও সরসতা দেখিয়া বিস্মৃত হইয়াছি— অথচ ইহার মধ্যে পাঠকদের জানিবার ভাবিবার বুঝিবার কথাও অনেক আছে। তোমার এই সংগ্রহটি কেবলমাত্র ছুটির সময় পড়িয়া তাহার পরে পাতা ছিঁড়িয়া, ছবি কাটিয়া, কালি ও ধূলার ছাপ মারিয়া জঞ্জালের সামিল করিবার সামগ্রী নহে— ইহা আমাদের শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারে নিত্য ব্যবহারের জন্যই রাখা হইবে।”^{১৪}

এই মন্তব্যই প্রমাণ করে পত্রিকাটির গুরুত্ব।

‘সাধনা’

শিশুদের পত্রিকার জগৎ থেকে আবার বড়দের জগতে ফিরে যাওয়া। ‘বালক’ এর পর ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরোলো ‘সাধনা’। সাধনাতে ‘কাশিমের মুরগি’ নামাঙ্কিত একটি হৃদয়বিদারক গল্প ছাপা হয়েছিল। লেখক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পের কাহিনী কাশেম বিন্দ্র রাত্রিযাপন করে কাকার লোভের আশুণ থেকে বাঁচিয়ে ছিল তার ভালোবাসার মুরগিটিকে। সুধীন্দ্রনাথ খুব বেশি লেখেননি। আমাদের হতবাক করে এমন চমৎকার লেখনি যাঁর, তার যথাযথ ব্যবহার হয়নি দেখে।

‘সাধনা’র আয়ুষ্কাল মাত্র চার বছর। এক বছর ঘোষিত সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাকি তিন বছর ‘সাধনা’ সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও কাজ সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘সাধনা’ ছিল একান্তই রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা রবীন্দ্রময়। তাঁর নামাঙ্কিত গল্পের সঙ্গে প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী বের হয়েছে। ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, ‘সম্পত্তি সমর্পণ’, ‘কঙ্কাল’, ‘মুক্তির উপায়’, ‘ক্ষুধিত পাষণ’- এর মতো গল্প প্রকাশিত হয়েছে সাধনাতে। ‘সাধনা’-তে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেকেই সাধনাতে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ‘সাধনা’ পত্রিকাটিকে খুব ভালবাসতেন। তিনি বলেছিলেন— “সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো” (ছিন্নপত্রাবলী)। তিনি সেই কুঠারে কখনো মরচে পড়তে দেন নি। তাঁর রচনাসম্ভার পাঠক কে পরিতৃপ্তি দান করেছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, ঠাকুরবাড়ির অনেকের রচনা স্থান পেয়েছিল ‘সাধনা’ পত্রিকাতে।

‘পুণ্য’

রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথের সন্তান-সন্ততি ছিল অত্যন্ত গুণবতী। হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, কিন্তু মুক্ত-মনের আধিকারিণী। তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ স্বতন্ত্রে উজ্জ্বল এবং প্রগতিশীল। তাঁরই পুত্র ঋতেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ‘পুণ্য’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশকাল ১৩০৪ বঙ্গাব্দ। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল পবিত্র কাজ করার

উদ্দেশ্যে। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখা ছিল এতে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান লাভ করবে এবং বলা হয়েছিল—

“ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে। এখানে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা গণের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা যেন আমাদের এই পুণ্যকর্মে সহায়তা করেন।”^{১৫}

উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকাগুলির অন্যতম ছিল ‘পুণ্য’। ‘পুণ্য’ র কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন ঋতেন্দ্রনাথ। সম্পাদক ছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। শুধু মনোরঞ্জন নয়, সমাজ জীবনে ও সাহিত্যে পত্রিকাটির গুরুত্ব আছে। এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। কাব্য ও কথা সাহিত্যের চর্চা নয়, পুণ্য পত্রিকায় নানা রকমারি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী রক্ষন প্রণালী নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। তিনি রক্ষনবিদ্যাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত যে ক’টি পত্রিকা বেরিয়েছিল তার মধ্যে স্বল্প পরিচিত হল ‘পুণ্য’। পত্রিকাটিতে হেমেন্দ্রনাথ-সহ তাঁর পরিবারের মানুষরাই প্রাধান্য পেয়েছে। হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী নীপময়ীর রঙিন ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তাঁর আঁকা ‘হরপার্বতী’র ছবি পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছিল। পত্রিকায় হেমেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। ইচ্ছাশক্তির জন্যই ‘পুণ্য’ বেরিয়েছিল। পত্রিকার পথে বাধা এসেছে, সমস্যা এসেছে কিন্তু পত্রিকাটি সমানতালে বেরিয়েছে। তবে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হয়নি। পত্রিকাটি ছাড়া হয়তো হেমেন্দ্রনাথের পুত্র কন্যাদের গুণাবলী অধরা রয়ে যেত। ‘পুণ্য’-র প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বাড়ির অনেকেই নিজেকে মেলে ধরেছেন। ‘পুণ্য’-কে বাদ দিলে ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যচর্চা অপূর্ণ হয়ে যায়।

‘আনন্দ সঙ্গীত’

ঠাকুরবাড়ি থেকে আরো কয়েকটি পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তেমনই একটি পত্রিকা ‘আনন্দ সঙ্গীত’। সংগীত শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটে। এর সম্পাদক ছিলেন ইন্দিরা দেবী এবং প্রতিভা দেবী। যুগ্ম সম্পাদনায় পত্রিকাটি আট বছর সগৌরবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিভা দেবী লিখেছিলেন - “যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, যাঁহারা সংগীত প্রিয়, তাহাদের কাছে আমাদের এই নিবেদন, নিজেরা অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহক হইয়া এবং অনেক গ্রাহক করাইয়া ইহার সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবেন।” (আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রস্তাবনা প্রতিভা দেবী) পত্রিকাটি যে সংগীত বিষয়ক তা আখ্যাপত্রে উল্লেখিত। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সহজে গান শোনানো।

ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা আলোচনা সম্পর্কে বলা যায়— পত্রিকা সম্পাদকগণ যখন পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন, তখনও এ দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়নি বিশেষত স্বর্ণকুমারী ও জ্ঞানদানন্দিনীর সময়। দুজনেরই আবির্ভাব উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। তখন রামায়ণ- মহাভারত পড়া, কিংবা গোয়ালা, মুদির হিসেব রাখার জ্ঞান যথেষ্ট বলেই মনে করা হত। স্বর্ণকুমারী ঠাকুর পরিবারে প্রচলিত অন্তপুরের শিক্ষা পেয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীও গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েছেন শৈশবে। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ও সংস্কৃতি মেয়ে বধূদের পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের ভার নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এককথায় বললে বলতে হয়, বাঙালি মেয়ের ভাবনা চিন্তার অগ্রগতির বিষয়ে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল এই পত্রিকাগুলি।

Reference:

১. শাসমল, পশুপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৮ পৌষ, পৃ. ৮৭
২. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুভাব, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ. ৬৭

৩. ভট্টাচার্য, সূতপা রচিত, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.); উনিশ শতকে নারী আলোচনা এবং স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী', স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী, পূর্বা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৪২
৪. তদেব, পৃ. ৪৩
৫. ভট্টাচার্য, শোভারানী, মহিলা- সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা, (প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব), কল্যাণী, জুলাই, ২০০০, পৃ. ৫২
৬. চৌধুরানী, সরলাদেবী, জীবনের ঝরাপাতা, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, দে'জ পাবলিকেশন, জানুয়ারি, ২০০৭ সংস্করণ, পৃ. ১৪৭
৭. তদেব, পৃ. ১৪৮-১৪৯
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ জন্মশতবার্ষিকী সং, ১৩৬৮, পৃ. ১১২
৯. তদেব, পৃ. ১১৩
১০. দেব, চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৮, পৃ. ৮৩
১১. সেনগুপ্ত, দীপক, 'বালক', অবসর, তথ্য ও বিনোদনের ওয়েবসাইট, [বালক \(Old Bangla Magazine\)](#)
১২. রায়, নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা, দি বুক এম্পোরিয়াম, ১৩৪৮ সং, পৃ. ২০০
১৩. দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী (সম্পা.); বালক, দে'জ সংকলন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৭, পৃ. ৩১৫
১৪. মিশ্র, সুবিমল রচিত; মুনতাসির মামুন (সম্পা.); 'শিশু কিশোর সাময়িক পত্র', দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্র, কলকাতা, পুস্তক বিপনী, ২০০০, পৃ. ২৮৭
১৫. ভট্টাচার্য, শোভারানী, মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য- পত্রিকা, (প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব), কল্যাণী, জুলাই, ২০০০, পৃ. ৬৩